ইসলামি শাসন ও আধুনিক জাতিরাষ্ট্র

সাজ্জাদ জহির

?????? ???????????

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে খ্রিস্টবাদের অনুসারীদের মধ্য থেকে রিফর্মেশন আন্দোলন শুরু হয়। ইউরোপের রাজনৈতিক ঐক্যের কেন্দ্র ছিল ক্যাথলিক খ্রিস্টবাদ। রিফর্মেশন আন্দোলনের কারণে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একচেটিয়া অধিকার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যে ধারাটি খ্রিস্টবাদের মাঝে বিভাজন তৈরি করে তা প্রোটেস্ট্যান্ট ধারা নামে পরিচিত হয়। ক্রমান্বয়ে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে ইউরোপে কুখ্যাত ধর্মযুদ্ধের সূচনা হয়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। এর মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ছিল 'ত্রিশ বছরের যুদ্ধ' (১৬১৮–১৬৪৮)।

বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতাসীন ক্যাথলিকদের সাথে বিদ্রোহী প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার এই যুদ্ধে পঞ্চাশ লাখেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৬৪৮ সালে দক্ষিণ জার্মানির ওয়েস্টফালিয়া নামক স্থানে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে আপসরফা হয়। ফলশ্রুতিতে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। শান্তিচুক্তির এই ঘটনা পরবর্তী সময়ে বিশ্ব ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক ইতিহাসবিদ ও রাজনৈতিক গবেষকের মতে, ওয়েস্টফালিয়ার শান্তিচুক্তির মধ্য থেকেই আধুনিক 'জাতিরাষ্ট্র'-এর ধারণার জন্ম হয়। দীর্ঘ যুদ্ধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে ইউরোপের খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। এরপর নতুন নাম দিয়ে বিভিন্ন নগররাষ্ট্র ভাগ করে দেওয়া হয়। পরে বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এই চিন্তাধারা সর্বত্র ব্যাপকতা লাভ করে। গত শতাব্দীতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটি পূর্ণতা পায়।

সহজভাবে বললে, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা অনেকটা এমন— প্রথমে নির্দিষ্ট সীমানা এঁকে একটি ভূমির নামকরণ করা হয় এবং সেটিকে রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। এরপর সেই রাষ্ট্রের পরিচয়ে ঐ সীমানার অধিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়। এখানে জাতির পরিচয় তৈরি হয় সীমানা-নির্ধারিত রাষ্ট্রের মাধ্যমে। মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের আইনের ভিত্তিতে। ঐক্য, শত্রুতা-মিত্রতা, সুবিধা ও অধিকার—সবকিছুই নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের মাধ্যমে।

অর্থাৎ, যার কোনো রাষ্ট্র নেই, তার কোনো পরিচয়ও নেই। ফলে ধর্মীয় পরিচয় বা গোত্রীয় পরিচয় কোনো কিছুরই তেমন কোন গুরুত্ব বা স্বীকৃতি নেই। এক্ষেত্রে এ ধারণাই গড়ে তোলা হয় যে- জাতিরাষ্ট্র বাতিল করে দিলে বা ভেঙে ফেললে, এর মাধ্যমে জাতির অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। রাষ্ট্রকে ব্যক্তির পরিচয় ও চিন্তার কেন্দ্ররূপে স্থির করা এবং সার্বভৌম ঘোষণা করার যে ধারণা- তা মূলত খ্রিস্টীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা থেকেই আসা।

ফরাসি ও আমেরিকান বিপ্লবের পর সেক্যুলার রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম

ধরে নেয়ার চিন্তাটি রাজনৈতিক রূপ পায়। রাষ্ট্র ও সরকার বা শাসকের ধারণার মাঝে তফাৎ রয়েছে। সরকার বা শাসকগোষ্ঠী যা-ই বলি, তা হলো নির্দিষ্ট কিছু সংগঠিত মানুষ, যারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে। সমাজের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব মেটানো এবং প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এটা জোরপূর্বক হতে পারে বা সম্মতিতেও হতে পারে। তবে আমাদের দেশে রাষ্ট্র ও সরকার প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও বাস্তবে রাষ্ট্র সরকারের চেয়ে অনেক বেশি কিছু বোঝায়। আমাদের দেশে রাষ্ট্র বলতে প্রধানত বোঝায়:

(১) রাজনৈতিক দল, যারা সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে সরকার গঠন করে

(২) সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও

(৩) বিচার বিভাগ

এই তিনের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশেষ কাঠামো। যারা শক্তিবলে কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। এই বিশেষ ধরণের সংগঠিত শক্তিকেই আমাদের দেশে রাষ্ট্র বলা হয়। তবে শুধু এই কাঠামোগুলোই নয়, যে ধারণাটিকে কেন্দ্র করে এই সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পরযুক্ত হয়ে মানুষকে শাসন করে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাটিই মূলত আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা; যা সরকারব্যবস্থাকে অনিবার্যভাবেই করে তোলে নিপীড়ক ও ইসলামবিরোধী।

এখানে একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলো—'আধুনিক' জাতিরাষ্ট্রের ধারণা যদি এতই নতুন হয়, তবে এর আগে কী ছিল? জাতিরাষ্ট্রের আগে প্রাক-আধুনিক যুগে হাজার হাজার বছর ধরে শাসনকাঠামোগুলো সাম্রাজ্য, নগররাষ্ট্র, ইমারাহ, দাওলা, খিলাফাহ ইত্যাদি নামে পরিচিত থাকলেও সেগুলো স্রেফ সরকারব্যবস্থাই ছিল, যারা দ্বীনি লক্ষ্য নিশ্চিত করা, জনগণের প্রতিরক্ষা ও প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে নিজেদের বৈধতা নিশ্চিত করত। স্বয়ং নিজেই মানুষের আনুগত্যের পরম কেন্দ্র হয়ে উঠত না। এই সরকারকাঠামোগুলো ছিল মানুষের নিরাপদ, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত জীবনযাপন নিশ্চিতের মাধ্যম। উদ্দেশ্য না।

এসব শাসনকাঠামোতে মানুষের পরিচয়, ঐক্য ও লেনদেনের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করত কোনো না কোনো দ্বীন বা ধর্ম। সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হলে তাদের শাসনকর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পরত। দীর্ঘ প্রায় তিনশত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও বিভিন্ন বড় বড় যুদ্ধের পর, ক্রমান্বয়ে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা দুনিয়াব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত ইসলামী রাজনীতিতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের আদলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বহুল প্রচলিত। এসকল ইসলামপন্থীদের ভাষ্যমতে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো বজায় রেখেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অর্থাৎ, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের কিছু মৌলিক উপাদান যেগুলো ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেগুলো বাদ দিয়ে, কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হবে। তাদের মতে, এই 'ইসলামী' জাতিরাষ্ট্র ইসলামী শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সক্ষম হবে। "আসলেই এমনটা সম্ভব কি না" এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা তুলনামূলকভাবে নতুন। ১৭৭৬ সালের আমেরিকান বিপ্লব পরবর্তী আমেরিকা এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্সকেই অনেক ইতিহাসবিদ এবং গবেষক আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রথম দুটি নজির মনে করেন। লক্ষ্যণীয় যে, এর ইতিহাস আড়াইশ বছরের বেশি নয়। অর্থাৎ, এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যা আদি, চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়। বরং এর একটি নির্দিষ্ট ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট রয়েছে। এটি একটি পশ্চিমা সৃষ্টি, যা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান হলো:

১. জাতি

২. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড

৩. রাষ্ট্র

৪. সার্বভৌমত্ব

অর্থাৎ, আধুনিক রাষ্ট্র হলো একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট জাতির রাষ্ট্র, যার সার্বভৌমত্ব রয়েছে। এর অর্থ হলো- জাতিরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্বে আসার পূর্বশর্ত হিসেবে বলা হয়—ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, রাজতন্ত্র কিংবা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য একটি জাতির সম্মিলিত বা সাধারণ অভিপ্রায় থাকতে হবে। এই সাধারণ অভিপ্রায়ের ভিত্তিতেই একটি জাতি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে।

একই সঙ্গে সবকিছু নির্ধারণের চূড়ান্ত অধিকার বা সর্বময় ক্ষমতা সেই রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। জনগণ রাষ্ট্রের প্রণীত আইন ও নিয়মকানুনের অধীন থাকবে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে তার জাতির ওপর সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়। সাধারণত ধরে নেয়া হয়, এই রাষ্ট্র জনগণের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অথচ, প্রকৃত অর্থে জাতিরাষ্ট্র মূলত খ্রিষ্টীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই সেক্যুলার রূপ। কিভাবে?

মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রিস্টান রোমান সাম্রাজ্য ছিল একটি 'ধর্মতান্ত্রিক' কাঠামো (Theocratic State)। তখন গির্জা (পোপ) ও সম্রাট—দুই শক্তির মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত ছিল। আইন, নৈতিকতা, শিক্ষা, এমনকি রাজার মুকুট পরানো পর্যন্ত নির্ভর করত পোপের অনুমোদনের ওপর। ফলে ধর্মই ছিল রাজনীতির ভিত্তি, যদিও তা ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এরপর ধর্মসংস্কার আন্দোলন, প্রোটেস্ট্যান্টদের উত্থান ও পরবর্তী ধর্মযুদ্ধগুলির (তার মধ্যে ত্রিশ বছরের যুদ্ধ অন্যতম) মাধ্যমে গির্জার কর্তৃত্বকে চুরমার করে দেয়া হয়। ফলে আগে যা ছিল 'ঈশ্বরের আইন' এখন তা বদলে হয়ে গেল 'রাষ্ট্রের আইন'। আগে মানুষের পরিচয় ছিল 'খ্রিষ্টান' এখন তা বদলে হয়ে গেল 'ফরাসি/জার্মান নাগরিক'। অর্থাৎ রাষ্ট্র পুরোপুরি 'ধর্মনিরপেক্ষ রূপ' নিল। তবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানে এই নয় যে ধর্ম একেবারে নেই; বরং 'ধর্মকে ক্ষমতা ও রাজনীতি থেকে সরিয়ে ফেলা'। আর ধর্মের হাতে থাকা ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের হাতে অর্পন করা হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে - রোমান খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের ক্ষমতা কাঠামোকে ঠিক রেখে 'ঈশ্বর'-এর বদলে তদস্থলে বসানো হলো 'রাষ্ট্র'-কে। গির্জা যেমন নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব দাবি করত, একইভাবে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রও এখন নিজেকে 'সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supreme Authority)' হিসেবে দাবি করে। জাতিরাষ্ট্রের জন্য জাতি ও রাষ্ট্র—দুটিই অপরিহার্য। এ দুটির কোনো একটি ছাড়া জাতিরাষ্ট্র সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকে থাকার মাধ্যমে জাতির ধারণা টিকে থাকে। আবার রাষ্ট্র ছাড়া জাতির অস্তিত্বও চিন্তা করা যায় না।

উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার কথা ধরা যাক। আমেরিকা নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে হলে প্রথমে একটি ভৌগোলিক সীমানা টেনে নির্ধারণ করা হবে। এরপর বলা হবে, এই সীমানার ভেতরে থাকা সব মানুষের পরিচয় হলো—আমেরিকান। এই আমেরিকান নামক জাতি তৈরি করার পর রাষ্ট্রের তৈরি মূল্যবোধ ও আইনকানুনকে কেন্দ্র করে ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জীবন আবর্তিত হবে। কোনো ধর্মীয় বিধান বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পালন করতে হলেও তা অবশ্যই রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তাই আমেরিকা নামক জাতিরাষ্ট্রকে কার্যকর হতে হলে 'রাষ্ট্র'-কে সকল ধর্ম বা দ্বীন, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। এই আলোচনার লক্ষণীয় বিষয় হলো, কেবল একটি ভূখণ্ড ও এর অধিবাসীদের নির্দিষ্ট একটি জাতি আখ্যায়িত করার মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়। বরং ওই জাতি তাদের সংহতি, মূল্যবোধ ও শত্রু-মিত্র নির্ধারণের মানদণ্ড রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করে। এভাবেই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে।

এজন্যই জাতিরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল লক্ষ্য হলো নিজেকে চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব করা। নিজের অস্তিত্বকে ক্রমাগত স্থায়ী ও শক্তিশালী করা জাতিরাষ্ট্র কাঠামোর প্রধান লক্ষ্য। এমন নয় যে, শাসনের সুবিধার জন্য রাষ্ট্র নিজেকে স্থায়ী বা শক্তিশালী করতে চায়। বরং রাষ্ট্র নিজেই একটি লক্ষ্য, কোনো লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম নয়।

রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই টিকে থাকে। এর সাথে সাথে রাষ্ট্রের আরেকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্র নিজেই সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হলে এর অর্থ দাঁড়ায়: নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও সুরক্ষার তাগিদে রাষ্ট্র যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। সেই পদক্ষেপ ধর্ম বা সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিতে নৈতিক হোক কিংবা অনৈতিক। সুতরাং, আধুনিক রাষ্ট্র বা জাতিরাষ্ট্রের মূল ধারণার মধ্যে প্রচলিত নৈতিকতা বা অনৈতিকতার কোনো স্থান নেই। রাষ্ট্র কেবল নিজের অস্তিত্বের জন্যই টিকে থাকে এবং এটি নিজেই সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত কর্তৃত্ব।

আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র সত্তাটাই এমন, যা নিজ স্বার্থের জন্যই কেবল টিকে থাকে; এর অস্তিত্ব অন্য কোনো কারণ বা মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত উৎস হয়ে উঠে। যার ওপরে আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। রাষ্ট্রের আইনপ্রণেতারা তাই এমন আইনই বানায় যা রাষ্ট্রের কর্তাদের যথাসম্ভব ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগী করে তোলে। এখানে রাষ্ট্রের পক্ষে জনবান্ধব, সাম্যভিত্তিক আইন তৈরি করা তাই সম্ভব হয় না। তাই ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রে আইনের শাসন (Rule of Law) যেমনই হোক না কেন- তা শেষ পর্যন্ত বৈষম্যমূলক, নিপীড়নের হাতিয়ারই রয়ে যায়।

একটি উদাহরণ পেশ করা যাক। জনগণ থেকে আহরিত আয়কর হল যেকোন আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক

ভিত্তি। আইনের শাসনের নামে আয়কর নামক ব্যবস্থা কিভাবে একটি নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় রুপান্তরিত হয় তা আমরা নিচের উদাহরণ থেকে দেখব। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত আয়কর নির্ধারণে করযোগ্য আয় এবং করদাতার অবস্থান (যেমন নারী, পুরুষ, প্রবীণ নাগরিক) বিবেচনা করা হয়। ২০২৫–২০২৬ করবর্ষ অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয়করের হিসাব হবে এভাবে:

[illegible]

সাধারণ পুরুষ করদাতা: ৩,৫০,০০০ টাকা

নারী এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব করদাতা: ৪,০০,০০০ টাকা

তৃতীয় লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধী করদাতা: ৪,৭৫,০০০ টাকা

গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা: ৫,০০,০০০ টাকা

প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা-মাতা বা আইনগত অভিভাবকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা আরও ৫০,০০০ টাকা বাড়বে।

[illegible]

করমুক্ত সীমা বাদ দেওয়ার পর:

পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা: ৫%

পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা: ১০%

পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা: ১৫%

পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা: ২০%

অবশিষ্ট আয়ের ওপর: ২৫%

তাহলে বার্ষিক আয় ১০ লাখ টাকা হলে সাধারণ পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:

১. প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা: করমুক্ত।

২. পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা × ৫% = ৫,০০০ টাকা।

৩. পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা × ১০% = ৪০,০০০ টাকা।

৪. অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকা × ১৫% = ২২,৫০০ টাকা।

মোট কর = ৫,০০০ + ৪০,০০০ + ২২,৫০০ = ৬৭,৫০০ টাকা।

সুতরাং বাৎসরিক ১০,০০,০০০/ টাকা আয় হলে একজন সাধারণ পুরুষ কর দাতাকে ৬৭,০০০/ টাকা কর দিতে হবে। অর্থাৎ ৬.৭ % হারে তাকে আয়কর দিতে হবে৷ আর যদি কারো সম্পদের পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা হয়? বা আরো বেশী? সেক্ষেত্রে প্রায় পুরো সম্পদের চার ভাগের এক ভাগই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দিতে হবে! অর্থাৎ একজন ব্যক্তি নিজের কষ্টার্জিত উপার্জনের এক চতুর্থাংশ প্রশ্নাতীতভাবে রাষ্ট্রকে জমা দিতে বাধ্য! এবং এই অর্থের বড় অংশই ব্যয় হয় রাষ্ট্র পরিচালনের লক্ষ্যে!!

অথচ, যাকাত ব্যবস্থার সাথে একে তুলনা করলে কি এমন হবে? যাকাত মানে এক বছর শেষে কোন ব্যক্তির যে পরিমান টাকা (শরিয়তে এই সম্পদের বিভিন্ন ধরন আছে, তা আলোচনা সহজ করার স্বার্থে সংক্ষিপ্ত করা হল) অতিরিক্ত থাকবে সেই টাকাতে সোনা বা রুপার নিসাব অনুযায়ী যাকাতের পরিমান ধরা হবে, সেটা প্রায় ২.৫%। মোট আয় ১০ লাখ হোক আর ১০ কোটিই হোক তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু আয়কর নীতিতে আয়কর দিতে হবে মোট আয়ের উপর। বছর শেষে কত টাকা অতিরিক্ত থাকল বা টাকার অভাবে ঋণ নিতে হয়েছে কিনা তা দেখা হবেনা। তারপরেও এক্ষেত্রে কর হচ্ছে ৬.৭%।

আরো বড় কথা হচ্ছে, যাকাতের অর্থ কোথায় ব্যয় হবে তা যাকাতদাতা জানেন। সরকারের কেউ তা পরিবর্তন করতে পারবে না। এতে রদবদলে আইনও করতে পারবে না। কিন্তু করনীতি বছর বছর আধুনিক রাষ্ট্র পরিবর্তন করতে পারে এবং কোথায় কিভাবে তা ব্যয় করবে তাতে করদাতার জানাও সম্ভব না! এজন্যই দেখা যায়, সাধারণ মানুষের নিজের হাতের কামাইয়ের চার ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্র জোরপূর্বক নিয়ে নেয় শুধুমাত্র "শাসন" করার অধিকার হিসেবে। এবং আমরা দেখতে পাই- করের টাকায় মন্ত্রীদের জন্য দুই সুইমিংপুলবিশিষ্ট ডাক বাংলো নির্মাণ করতে। এমপি-মন্ত্রী বা আমলাদেরকে দেখা যায় মানুষের করের টাকায় ঘন ঘন বিদেশ সফর করতে।

এছাড়াও আমরা নিত্তনৈমিত্তিক জীবনে যা কিছু কিনিনা কেন তাতে প্রায় ১৫% ভ্যাট ধরা হয়, যা পন্যের দামের সাথেই কেটে নেওয়া হয়। এর সাথে সাথে গাড়ি থাকলে, ব্যবসা থাকলে যে আরও কত রকমের কর, টোল বা ভ্যাট দিতে হয় তার হিসাব করাও কঠিন। জনগণ থেকে প্রাপ্ত আয়কর, ভ্যাট এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কর নিয়ে সরকার মন্ত্রীদের জন্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য বিশাল বিশাল বাংলো বানাচ্ছে, কোটি টাকা দামের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানির সুবিধা দিচ্ছে। জনগণকে সেবা দেওয়ার নাম করে রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে সম্পৃক্তরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। তারাই হল এখানে সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী। অথচ যে সেবক সে তো চাকুরীদাতা (অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ) থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল না। এবং এই অদ্ভুতুড়ে বিষয়টি কেন এত স্বাভাবিক!?

কারণ আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাই এমন। আধুনিক রাষ্ট্র সার্বভৌম ও জবাবদিহিতার উর্ধ্বে। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের উন্নত জীবনযাপনে ভূমিকা রাখা, তাদের সেবা করাই সাধারণ মানুষের দায়িত্ব। বিপরীতটা নয়। খেলাপি ঋণের প্রসঙ্গ দেখা যাক। যারা হাজার হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ করেছে তাদের ঋণ মাফ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সামান্য কয়েক হাজার টাকার ঋণ মওকুফ হয় না।

অর্থাৎ আইন করা হচ্ছে যারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছাকাছি তাদের সুবিধার জন্য।

এভাবে রাষ্ট্র নিজেই চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার কারনে যেভাবে ইচ্ছা জনগনের উপর নিপীড়নমূলক আইন বা নিয়মকানুন চাপিয়ে দিতে পারে৷ কারণ কোনো খোদায়ী ইচ্ছার কাছে সে জবাবদিহিতায় বাধ্য নয়। এবং মানুষও তাই জানে না কিভাবে তাকে জবাবদিহিতায় আনতে সক্ষম। কারণ আধুনিক রাষ্ট্র শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, কারাগারের ভয় দেখিয়ে কিংবা সাংস্কৃতিক ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সেভাবেই গড়ে তুলছে। বলা হয়ে থাকে, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র হলো একটি সার্বভৌম ইচ্ছার প্রকাশ। এই সার্বভৌমত্বের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রের আইন বা বিধিমালার মাধ্যমে।

উপরের আলোচনা থেকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার। যেহেতু জাতিরাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো সার্বভৌমত্ব; তাই এটি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা বাতিল করতে পারে।

যেহেতু আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো নিজেকে টিকিয়ে রাখা, তাই এর আইনের সঙ্গে ধর্মীয় বা প্রচলিত নৈতিকতার কোনো সম্পর্কের আবশ্যকতা নেই। জাতিরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনী বিষয় ও নৈতিক বিষয়- পুরোপুরি আলাদা। আইনী ও নৈতিকতার এই স্পষ্ট পৃথকীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বত্রই দৃশ্যমান। জাতিরাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতির বাইরে কোনো আইন প্রণয়ন করা যায় না। রাষ্ট্র এমন কোনো আইন তৈরি করলেও, তা সংবিধানবহির্ভূত হওয়ার কারণে বিচার বিভাগ সেই আইন বাতিল বা খারিজ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখে।

আবার জাতিরাষ্ট্রের আইন-কানুনগুলো এমন জটিলভাবে তৈরি করা যে, জনগণ তা সহজে বুঝতেও পারে না। ফলে সে তার অধিকার সম্পর্কেই জানেনা। মানুষ জানে না সরকার, আইন ও বিচার বিভাগ কিভাবে কাজ করে। যার দরুন জনগণ সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে পারে না। জনপ্রতিনিধি দিয়েও জনগণ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনা। কেননা, জনপ্রতিনিধিরা নিজেরাই রাষ্ট্রের অংশ হওয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু জনপ্রতিনিধিদেরকে জন্য রাষ্ট্রকে ক্রমাগত আরো শক্তিশালী, কর্তৃত্ববাদী করার দায়িত্বও পালন করতে হয়।

আবার এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, রাষ্ট্র জনরোষ ও পতন থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করতে যে আইন তৈরি করে- তা জনসেবা, সুবিচার বা সাম্যের লক্ষ্যে নয়; বরং, নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই। তাই আইনের শাসনের মুখভরা বয়ানে অভিভূত হবার কিছুই নেই। মোটাদাগে বললে, নিপীড়ন ও স্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র আর লিবারেল (উদার গনতান্ত্রিক) রাষ্ট্রের মধ্যে চরিত্রগত কোনো মৌলিক তফাৎ নেই। পার্থক্য হলো, কে কত বেশি নিপীড়ন করে সেখানে। এবং কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যায় এবং জনরোষের কবল থেকে বেঁচে থাকা যায়।

রাষ্ট্রের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে সাথে 'জাতি' নামক ধারণাকেও ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ জাতিরাষ্ট্রের রাজনীতি বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল পরিচায়ক হলো জাতীয়তাবাদ। এর সঙ্গেও দ্বীন, মূল্যবোধ বা নৈতিকতার কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা বা শাসনের বৈধতা আদায়ের জন্য যতটুকু নীতি-নৈতিকতার আলোচনা প্রয়োজন, জাতিরাষ্ট্র শুধু ততটুকুতেই আগ্রহী।

নিজ জাতি অন্য যেকোনো জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এটাই জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র। কেন্দ্রীয় ধারণা এটিই থাকে যে- নিজ জাতির সাংস্কৃতিক আভিজাত্য, আধিপত্য, অন্যান্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমেই একটি জাতি গৌরবান্বিত হয়। জাতীয়তাবাদের এই আত্মকেন্দ্রিক ও অহংকারী আচরণের পাশাপাশি অন্য জাতির প্রতি একধরনের অবজ্ঞা বা ঘৃণাও যুক্ত থাকে।

অর্থাৎ, নিজ জাতিকে অন্য সব জাতির চেয়ে সর্বদা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার একটি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়। এর মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের মনে এক কৃত্রিম গৌরববোধ জাগ্রত করা হয়। জাতিরাষ্ট্রের ধারণায় একজন নাগরিকের মূল পরিচয় নিহিত থাকে তার জাতির মধ্যে। জনপরিসরে এটাই তার প্রধান পরিচয় হিসেবে গণ্য হয়। অন্যদিকে তার ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত পরিচয় কেবল ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে।

বর্তমান বিশ্বজুড়ে অসংখ্য আলাদা জাতিরাষ্ট্র রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোনো না কোনো জাতিরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে হয়। তাই জাতীয় পরিচয় ছাড়া আধুনিক বিশ্বে একজন মানুষের কোনো বৈধ রাজনৈতিক পরিচয় থাকে না। এর অর্থ দাঁড়ায়, জাতিরাষ্ট্রের অধীনে একটি নির্দিষ্ট জাতিসত্তার অংশ হলেই কেবল একজন মানুষের পরিচয় পূর্ণতা পায়। অন্যথায় রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব বা পরিচয় থাকে না।

ফলে 'আমি' ধারণার আগে 'আমরা' ধারণার উৎপত্তি ঘটে। এই 'আমরা'-এর সমষ্টিগত অস্তিত্ব ছাড়া 'আমি'-এর একক কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই কারণেই জাতিরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নিজেকে একীভূত করতে পারার মধ্যেই একজন নাগরিকের সার্থকতা নিহিত। অথচ জাতীয়তাবাদের কোনো নৈতিক বা ধর্মীয় মানদণ্ড নেই। কোনো আল্লাহমুখী, উন্নত মানুষের বিকাশে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র তাই নিজেই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক।

জাতিরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো - বন্ধু ও শত্রুর বিভাজন। এই বিভাজন সম্পূর্ণভাবে জাতির নিজস্ব স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। যেহেতু জাতিরাষ্ট্র চরমভাবে সার্বভৌম, তাই এটি নিজের প্রয়োজনে যেকোনো সময় নাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ বা যুদ্ধাভিযানে শামিল করতে পারে। এই জাতীয় আদেশ অমান্য করা নাগরিকের জন্য গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে এমনও হতে পারে যে আধুনিক রাষ্ট্র সম্পূর্ণ অনৈতিক কারণে নাগরিকদের বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে। সেই যুদ্ধ নাগরিকের ব্যক্তিগত ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক হলেও তাকে যুদ্ধে যেতে হবে।

যেমন ধরে নেয়া যাক, মার্কিন বাহিনী অন্যায় ভাবে ইরাকের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। এখন মার্কিন বাহিনীর একজন মুসলিম সদস্য যদি মনে করে যে - তার মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে চালানো এই আগ্রাসন নেহায়েত এক অন্যায় আচরণ আর আমি এই অন্যায়ে শামিল হব না, তাহলে তাকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে বিচারের আওতায় আসতে হবে। তার ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ বা ন্যায়-অন্যায় বোধের কোন মূল্যই নেই আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে।

প্রচলিত আরেকটি ধারণা হচ্ছে - আধুনিক রাষ্ট্র নিজেদের তৈরি করা আইনের ক্ষমতার প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও বিচারিক কাজ সম্পন্ন করে

ক্ষমতার পৃথকীকরণ (Separation of Power) নীতি অনুযায়ী।

এর উদ্দেশ্য হলো, কোনো একজন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট বিভাগের হাতে যেন সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়। একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র যেন স্বৈরাচারী হয়ে না ওঠে। মূলত এটি আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতার ওপর আরোপিত একটি নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যেই আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়। যেমন:

১. আইন বিভাগ বা সংসদ (যারা আইন প্রণয়ন করে)

২. নির্বাহী বিভাগ বা মন্ত্রীসভা ও আমলাতন্ত্র (যারা প্রণীত আইনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে)

৩. বিচার বিভাগ বা সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালত (যারা প্রণীত আইনের আলোকে বিচার ফয়সালা করে)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো আইন বিভাগকে অন্যান্য বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখা। কিন্তু বাস্তবে প্রায় সর্বত্রই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। নির্বাহী বিভাগ প্রায়ই অন্য দুটি বিভাগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি আইনের শাসনের স্পষ্ট লঙ্ঘন। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ নিজেই আইন প্রনয়ণ করে, অথচ আইন প্রনয়ণ করার দায়িত্ব শুধুমাত্র আইন বিভাগের আর বিচার বিভাগের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হল বিচারিক প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। কিন্তু দেখা যায় প্রশাসন পরিচালনার সুবিধার্থে নির্বাহী বিভাগ নিজস্ব প্রশাসনিক আইন তৈরি করে। এই আইন লঙ্ঘিত হলে তারাই শাস্তি প্রদান করে।

এর অর্থ হলো, নির্বাহী বিভাগ একই সঙ্গে আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করছে। অন্যদিকে বিচার বিভাগও 'যৌক্তিকতা'-র দোহাই দিয়ে যেকোনো সাংবিধানিক আইন বাতিল করতে পারে। এ ছাড়া বিচার বিভাগ পূর্ববর্তী বিচারিক সিদ্ধান্ত অনুসরণের নীতির মাধ্যমে নতুন আইন তৈরি করতে পারে। এই আইন 'আইন বিভাগের' প্রণীত আইনের সমমর্যাদা লাভ করে।

ফলে এই তিনটি বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে সবসময় দেখা যায় যে - তারা একে অপরের দায়িত্বে ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। এটি তাদের ঠিক করে নেয়া গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা চলে যায়।

একটি উদাহরণ দেখা যাক। গত ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪, শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ১৭ বছর' শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় অন্তবর্তীকালীন সরকারের বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সদস্য মাসদার হোসেন বলেন,

"আজও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন। অথচ আইন বিভাগের কাজে প্রশাসন 'ইন্টারফেয়ার' করতে পারে না। বিগত ৫৩ বছরে কোনো রাজনৈতিক দল জনস্বার্থে আইন করেনি। তারা নিজেদের রকষা ও কষমতার স্বার্থে আইন করেছে। তারা কোনো কালাকানুন বাতিল করেনি।"

বিচারবিভাগ পৃথকীকরণে সাবেক জজ মাসদার হোসেন মামলাটি বেশ বিখ্যাত। তাই সেই ব্যক্তির এই উক্তিই যথেষ্ট নিপীড়নমূলক

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বোঝার জন্য। ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় স্বাধীন বিচারবিভাগের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা যে সম্ভব নয় - তা যেমন মাসদার হোসেনের কথায় স্পষ্ট, একইভাবে আধুনিক রাষ্ট্র যে জনস্বার্থে আইন তৈরি করে না বরং নিজেদের রক্ষা ও ক্ষমতার স্বার্থে আইন তৈরি করে সেটিও স্পষ্ট। সম্প্রতি প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুরুর পক্ষ থেকে এমপিদের বেতন পাচ লাখ টাকা এবং মন্ত্রীদের বেতন দশ লাখ টাকায় উন্নীত করার দাবী থেকেও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী মানসিকতার বিষয়টি বোঝা যায়।

এছাড়াও, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার হলো আমলাতন্ত্র বা আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র। এর মাধ্যমেই আধুনিক রাষ্ট্র তার আইন সর্বত্র প্রয়োগ করে। উপর থেকে নিচে বিস্তৃত এই পিরামিডীয় স্তরভিত্তিক কাঠামো আধুনিক রাষ্ট্রের পুরো ভূখণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে। এর এখতিয়ারের বাইরে কোনো মানুষ বা অঞ্চল থাকে না। ফলে সমাজে কোনো স্বাভাবিক পারস্পরিক সংযোগের অস্তিত্ব থাকে না। সমাজের স্বাধীনতা বা নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও থাকে না। আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের প্রভাব রাষ্ট্রের প্রতিটি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির ওপর পড়ে। যার ফলে রাষ্ট্রের কোনো নিপীরড়নমূলক বা অনৈতিক আইনের প্রভাব থেকে শেষ অবধি কেউই মুক্ত থাকে না।

রাষ্ট্র তার সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানসিকতা ও ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করে। রাষ্ট্র নিজের চাহিদা অনুযায়ী অনুগত, নিরীহ ও উৎপাদনমুখী নাগরিক তৈরি করে। রাষ্ট্র যেভাবে চায়, এই নাগরিকেরা সেভাবেই চিন্তা করে, দেখে ও কাজ করে। এছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদকে বিকশিত ও প্রচার করার জন্য সংস্কৃতিকে রাজনীতিকরণ করে। এর উদ্দেশ্য হলো, সবাই যেন জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে এবং জাতীয় পরিচয়কেই নিজের প্রধান পরিচয় হিসেবে দেখে। রাষ্ট্র কোনো 'স্বাধীন সামাজিক সংযোগ' (অর্থাৎ রাষ্ট্রকে না জানিয়ে বা অনুমতি না নিয়ে একে অপরের মধ্যকার কোনো স্বাধীন সম্পর্ক ও যোগাযোগ), সামাজিক স্বায়ত্তশাসন কিংবা রাষ্ট্রের সমান্তরাল কোনো সত্তাকে সহ্য করে না। কারণ, এর ব্যতিক্রম ঘটলে তা আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করে।

এর ফলে সমাজে বিচ্ছিন্ন, মোহগ্রস্ত ও আত্মকেন্দ্রিক নাগরিক তৈরি হয়। আধুনিক রাষ্ট্র এসব কিছুই করে জাতীয়তাবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এর সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিকতা কিংবা উন্নত মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের ক্রমশ যে নিম্নগামীতা, তার পেছনে মূল ভূমিকা আধুনিক রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা। কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র নিজেকে শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করতে গিয়ে ক্রমাগত মানুষকে বিচ্ছিন্ন, একাকী, হীনবল ও দুর্বলে পরিণত করে। মানুষকে বোঝানো হয়, স্বাধীনভাবে বিকশিত হবার মাঝে নয়, বরং অন্যের হক্ব নষ্ট করে হলেও নিজেকে শক্তিশালী করার মূল উপায় হলো যে কোনো উপায়ে রাষ্ট্রের অংশ হওয়া।

উপরের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার যে, আধুনিক রাষ্ট্র একটি আপাদমস্তক সেক্যুলার সত্তা। এটি কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে না, করতে সক্ষমও না। এবং আমাদের উপর ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া এই ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের ধারণা অত্যন্ত কর্তৃত্ববাদী ও বৈষম্যমূলক। একারণেই '৪৭, '৭১ এ যেমন লক্ষ প্রাণের বিনিময়েও স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সুবিচারের স্বাদ পাওয়া যায়নি। '২৪ এর আত্মত্যাগের পরেও কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাওয়া যাবেনা। মানুষের ব্যক্তি পর্যায়ের হোক আর সামষ্টিক হোক - কোনো উন্নতিই এই কাঠামো বজায় রেখে নিশ্চিত করা সম্ভব না।

[illegible]

এবার ইসলামী শাসনব্যবস্থার দিকে আলোকপাত করা যাক। এখানে আলোচনা করা হবে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃত কাঠামো নিয়ে, যা ইসলামের প্রায় বারোশ বছরের ইতিহাসে বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে। এই আদর্শ থেকে বিচ্যুতিকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা হবে, উদাহরণ হিসেবে নয়। এখানে সতর্কতার সঙ্গে 'ইসলামী রাষ্ট্র' শব্দটি এড়িয়ে 'ইসলামী শাসনব্যবস্থা' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আধুনিক রাষ্ট্র বোঝানো হয় না।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আধুনিক রাষ্ট্রের মতো প্রতারণামূলক কোন স্লোগান ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নামক স্লোগান দেয় ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে প্রায় সকল ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগে চলে যায়। ইসলামী শাসনব্যবস্থাতে এধরনের কোনো প্রতারনা নেই। এটা স্লোগানসর্বস্ব কোন ব্যবস্থা নয় যে, বলা হবে এক আর বাস্তবে দেখা যাবে আরেক। বরং দেখা যায় ইসলামী শাসনব্যবস্থায় এধরনের স্লোগান না থাকলেও ক্ষমতাকে পুরোপুরি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। একটু ব্যাখ্যা করলে পুরোপুরি বোঝা যাবে ইন শা আল্লাহ।

আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মতো ইসলামী শাসনব্যবস্থাতে শাসকের কোনো সার্বভৌমত্ব ছিল না। যেহেতু ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আল্লাহর দিকেই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকার ন্যস্ত করা হয় বা অন্যভাবে বললে - আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী শরীয়াহই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী, এজন্য শাসক বা শাসনকাঠামো সব সময় শরীয়াহর অধীনে থাকে। শরীয়াহর মূলনীতির আলোকেই তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বা তাকে শাসক হিসেবে মেনে নেয়া হয়। শরীয়াহই তাকে বৈধতা দেয় আবার শরীয়াহর কর্তৃত্ব মেনে না নিলে শরীয়াহই তাকে বাতিল সাব্যস্ত করে দেয়। আল্লাহর আদেশ-নিষেধই নৈতিকতা, আইন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত উৎস। শাসক বা জাতির অভিপ্রায়ে কোন কিছু নৈতিক বা অনৈতিক সাব্যস্ত হয়না।

সুতরাং ইসলামী শাসনব্যবস্থা যেহেতু সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়, তাই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মতো শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাতেই এর উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ ছিলনা। অর্থাৎ, এটি নিজে কোনো লক্ষ্য ছিল না। বরং লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম ছিল। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সকল মুসলিম বৃহত্তর উম্মাহর অংশ ছিল। এই উম্মাহ কোনো সীমানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি কোনো জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দ্বারাও সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এটি বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই ইসলামী ভূখন্ডে অন্ধ জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার কোনো জায়গা ছিল না, যাকে কেন্দ্র করে শাসকেরা অধীনস্থ জনগণকে নিয়ে ব্যাপক স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হতে পারত বা যত্রতত্র যুদ্ধঘোষণা করে দিতে পারত। ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে মুসলিমদের সাথে থাকা অমুসলিমদের বলা হতো আহলুয যিম্মাহ।

অর্থাৎ, এখানে কোনো জাতি বা রাষ্ট্রভিত্তিক পরিচয় প্রধান ছিল না। পরিচয় মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। তাহলে দেখা যাচ্ছে আধুনিক জাতিরাষ্ট্র যে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বারা অস্তিত্বে আসে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয়তাবাদ, সে দুইটি বৈশিষ্ট্য ইসলামী শাসনব্যবস্থাতে সম্পূর্ন অনুপস্থিত। এই দাবীকে আমরা আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করব।

এখানে "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রকৃত প্রকাশই হলো শরিয়াহ" কথাটার অর্থ কি?

শরীয়াহ একটি নৈতিক ও আইনী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার উৎস হলো কুরআন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস ও সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ইত্যাদি। শরীয়াহ মানে কেবল কিছু আইন বা হুদুদের (দন্ডবিধি) সমষ্টি নয়। বরং ইবাদতের পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, পারস্পরিক লেনদেন, আচার-ব্যবহারসহ জীবনের সব বিষয় শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত। এটি সেই মানদণ্ড, যার মাধ্যমে ইসলামী আইন অস্তিত্বে আসে। শরীয়াহ কোনো শাসকের প্রণীত নিজস্ব বিধিবিধান নয়। এটি মানুষ বা জনগণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশও নয়। এটি আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। আর ইসলামী আইন শরীয়াহ থেকেই উদ্ভূত।

কোনো একটি বিষয়ে আইনের বিধান কেমন হবে, সে বিষয়ে মুফতি শারঈ মূলনীতিকে সামনে রেখে ফাতওয়া বা মতামত দেন। কোনো বিশেষ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া না গেলে মুজতাহিদ ফকিহ শারঈ মূলনীতির আলোকে নিয়মতান্ত্রিক আইনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইজতিহাদ করেন। এরপর তিনি তার মত তুলে ধরেন। সে ক্ষেত্রে সেটি ইসলামী আইন হিসেবে বিবেচিত হয়। একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুজতাহিদ ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিলেও সবগুলোই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। এসব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

এ কারণে ইসলামী আইন ক্ষেত্রবিশেষে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। অর্থাৎ, এটি গতিশীল, নমনীয় ও অভিযোজনক্ষম। এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারা ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হলে, শরীয়াহ ইসলামী আইনের প্রয়োজনীয় অংশ পরিবর্তন সমর্থন করে।

তবে যেসব বিষয়ে দিকনির্দেশনা পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুরআনে উত্তরাধিকার আইনের নির্ধারিত অংশ অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট হার (ফারায়েজ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, “এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান”—এটি স্পষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।

একই ভাবে অনেক হারাম (নিষিদ্ধ) বিষয়ের স্পষ্ট তালিকা কুরআন সুন্নাহতে নির্দিষ্ট করা আছে যেমন মদ, শূকরের মাংস, সুদ (রিবা), ব্যভিচার—এসবের নিষেধাজ্ঞা কুরআন সুন্নাহয় স্পষ্ট। এগুলোর নিষেধাজ্ঞার বিধান ইজতিহাদের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায় না।

তবে কিছু বিষয় যূগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন সাধারণভাবে শরীরের কোন অঙ্গ কেটে ফেলার ব্যাপারে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা আছে। তবে অঙ্গ প্রতিস্থাপন (Organ Transplant) নামে প্রাচীন ইসলামী ফিকহের গ্রন্থে কোনো উল্লেখ নেই, কারণ তখন এ ধরনের চিকিৎসাবিজ্ঞান ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে যখন অঙ্গ প্রতিস্থাপন সম্ভব হলো, আলিমরা ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেন—যদি তা রোগীর প্রাণ বাঁচায় এবং দাতার ইচ্ছায় হয়, তবে তা জায়েজ। এখানে ‘প্রাণ রক্ষা’ (হিফজুন নফস) নামক শরীয়াহর মূলনীতিকে সামনে রেখে আইনটি তৈরি করা হয়েছে, যা সাধারণ অবস্থায় বৈধ নয়। অর্থাৎ কেউ চাইলেই বিনা প্রয়োজনে এক অঙ্গ কেটে আরেক অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে পারবেনা বরং জরুরতের মাধ্যমে এর বৈধতা আসে।

আরও কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এর। রাসূল (সা.) এর যামানায় মসজিদে ছিলনা কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মসজিদে আছে এমন আধুনিক প্রযুক্তি (লাউডস্পিকার, মাইক)-কে বৈধ মনে করা হয়। যেমন নবী (সা.)-এর যুগে মসজিদে আযান বা খুতবায়

মাইক বা লাউডস্পিকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সারা বিশ্বের মসজিদেই তা ব্যবহার করা হয়। কুরআন বা হাদিসে এটির নিষেধাজ্ঞা নেই, তাই ইজতিহাদের ভিত্তিতে এটি বৈধ হয়েছে। আযানের শব্দ বা সময় অপরিবর্তিত, কিন্তু তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম পরিবর্তিত হয়েছে।

উক্ত আলোচনার ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে অনেক বড় রকমের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রাচীনকালে লেনদেন হতো স্বর্ণ (দীনার) ও রৌপ্য (দিরহাম) দিয়ে। কুরআনে কিন্তু কাগুজে নোট বা ডিজিটাল মুদ্রার উল্লেখ নেই। ফকিহরা 'উরফ' (স্থানীয় রীতি) ও 'কিয়াস'-এর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—কাগুজে মুদ্রাও বৈধ। তবে কিছু শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। ইসলামী আইন একই সঙ্গে নৈতিক, আইনী ও সামাজিক। প্রাক-আধুনিক মুসলিম সমাজ- ইসলামী আইন ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

কিন্তু, আধুনিক সমাজে এমনটা দেখা যায় না। আধুনিক সমাজ এমন হয়ে গেছে যে - আইনী পেশা ও আইনী প্রক্রিয়া সমাজ থেকে প্রায় পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আইনী পেশার সাথে সম্পৃক্ত লোকজন, তাদের পোশাক, তাদের সংস্কৃতি, এমনকি তাদের ভাষাও সমাজ থেকে আলাদা কিছু। আর আমাদের মত পোস্ট-কলোনিয়াল দেশে আইনী কাঠামো যেহেতু ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া, তাই এখানকার সামগ্রিক সংস্কৃতি আমাদের দেশের সংস্কৃতির সাথে কোনোভাবেই খাপ খাওয়াতে পারেনা

অপরদিকে প্রাক-আধুনিক স্বাধীন মুসলিম সমাজে ইসলামী আইন ছিল মানবজীবনের সরাসরি অভিজ্ঞতা। ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী সমাজ নৈতিকতা ও আইনী মূল্যবোধকে নিজের জীবনের অংশ করে নিয়েছিল। সে যুগে ইসলামী আদালত বা বিচারালয়গুলো ছিল সমাজেরই একটি প্রতিষ্ঠান। বাদী-বিবাদি বা অন্য যে কেউই ইসলামী আইনের কাছে দ্বারস্থ হত, তারা কোনো জটিলতা ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সরাসরি আদালত বা কাজীর সামনে হাজির হতে পারত। কাজী ও অভিযোগকারীর মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা আইনজীবী থাকত না। ফলে অভিযোগকারী তার দৈনন্দিন সাধারণ কথ্য ভাষাতেই নিজের সমস্যা বা অভিযোগ সরাসরি তুলে ধরতে পারতেন। বিপরীতে আধুনিক আদালতে অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রতা, ভীতিকর ও প্রতিকূল পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে থাকা জটিল আইনী পরিভাষার ছড়াছড়ি দেখা যায়।

প্রাক-আধুনিক ইসলামী সমাজে তেমনটা ছিল না। এর প্রধান কারণ ছিল, এই বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কিছু ছিল না। সমাজের মানুষের সঙ্গে তাই বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি নিবিড় ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আদালতের মুখোমুখি হয়ে তারা কখনোই সমাজচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন অনুভব করত না। এ ছাড়া সে সময় সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মূল উৎস ছিল শরীয়াহ। সামাজিক রীতিনীতি ও রাষ্ট্রীয় আইন—উভয়ই শরীয়াহকেন্দ্রিক হওয়ায় ইসলামী সমাজে আধুনিক রাষ্ট্রের মতো আইনী ও নৈতিকতার মধ্যে কোনো পৃথকীকরণ ছিল না। এর ফলে ইসলামী সমাজের সাধারণ মানুষের মনে আইন ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকত। কোনো বিষয়ে কার কতটুকু অধিকার রয়েছে, তা তারা সহজেই বুঝতে পারত। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনো জটিল আইনী মারপ্যাঁচ ছাড়াই দ্রুততার সঙ্গে তাদের ন্যায্য অধিকার ও বিচার লাভ করত।

ইসলামী সমাজের আইনবিদ, আলিম, মুফতি ও কাজীরা সমাজের মধ্য থেকেই উঠে আসতেন। তারা তাদের পদ-পদবির চেয়ে

সমাজের মানুষ হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তারা সমাজের অন্তর্নিহিত অংশ ছিলেন। এ কারণে তাদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার বড় কোনো ব্যবধান ছিল না। বরং তারা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন। সমাজের মানুষের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াহর জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে শরীয়াহর জ্ঞান ও মূল্যবোধ সমাজের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল। এ কারণে সামাজিক নীতি-নৈতিকতা ও ইসলামী আইন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ছিল।

মুফতি ও আলিম-উলামারাই ছিলেন ইসলামী সমাজের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র। তারাই ছিলেন সমাজে শরীয়াহর রক্ষক। কোনো বিষয়ে শরীয়াহ লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না কিংবা সমাজ যুলুমের শিকার হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ে তারা নজর রাখতেন। আধুনিক সমাজের মত সমাজবিচ্ছিন্ন এলিট বা সুশীল সমাজের প্রয়োজন তাই ইসলামী সমাজে দেখা যেত না। প্রয়োজনও ছিল না।

মুফতি ও উলামারা সমাজ ও শরীয়াহর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন এবং শাসককে পরামর্শ দিতেন। সমাজে শরীয়াহ লঙ্ঘিত হলে কিংবা শাসকের অনৈতিকতা ও ভ্রষ্টতা দেখা দিলে তারা উম্মাহকে সচেতন করতেন। এভাবে তারা আল্লাহর ইচ্ছার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতেন।

এছাড়াও, শরীয়াহ থেকে উদ্ভূত আইন দিয়েই কাজী বা বিচারক বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। এবং শরীয়াহর শাসন সমুন্নত রাখতে পারার মাধ্যমেই শাসকের বৈধতা বজায় থাকত। বিচারক ও শাসক—উভয়ই শরীয়াহর প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। শরীয়াহ বা ইসলামী আইন তাদের ইচ্ছার অনুগামী ছিল না।

কাজী বা বিচারক শরীয়াহর আইন দিয়েই বিচার-ফয়সালা করতেন। তবে কেবল বিবাদ মীমাংসা করাই তার একমাত্র কাজ ছিল না। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় কাজীর আরও অনেক দায়িত্ব ছিল। যেহেতু তিনি যে সমাজকে সেবা দিতেন, সেই সমাজেরই সাধারণ স্তর থেকে উঠে আসতেন, ফলে তিনি তার সমাজ ও জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত থাকতেন। কাজী হওয়ার জন্য শরীয়াহ বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় রীতিনীতি ও জীবনধারা সম্পর্কেও পরিচিত থাকা জরুরি ছিল। তাই দেখা যেত যে - তিনি সমাজের মসজিদ, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণের দেখভাল করতেন। তিনি ও তার সহযোগীরা হাসপাতাল এবং ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা কেমন চলছে, তা পরিদর্শন করতেন। এতিমদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। যেসব মেয়ের কোনো উপযুক্ত অভিভাবক থাকত না, তাদের আইনগত অভিভাবক হিসেবে বিবাহের কাজ সম্পাদন করতেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ ও কলহ মীমাংসায় ভূমিকা রাখতেন, যেন তাদের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমাধান হয়। তিনি সামাজিক সম্পর্ক ভাঙার কারণগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করতেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করাও কাজীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। কাজীর আদালতে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন ও চুক্তিপত্রও সম্পাদিত হতো। এই কাজী ও তার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের আদালত ও বিচারকের আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কাজী শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তবে এই প্রতিনিধিত্ব মূলত নামমাত্র ছিল। কারণ, কাজী শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার করতেন এবং শরীয়াহর আইনের শাসন রক্ষা করতেন। শাসক তার ক্ষমতাবলে কেবল কোনো কাজীকে বরখাস্ত বা অপসারণ করতে পারতেন এবং কোনো ক্ষেত্রে তিনি কাজীর বিচারিক এখতিয়ারের পরিধিও

নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ করতে পারতেন। এর বেশি নয়।

কিন্তু কাজীর পদে যে বিচারকই স্থলাভিষিক্ত হতেন, তাকে শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করতে হতো। শাসক কোনো বিচারকের বিচারিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। এ ছাড়া কাজী তার পদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের অর্থ উপার্জনের অন্য উৎস থাকত। ফলে তারা এই পদের আয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলেন না। বিচারকার্যে শাসকের হস্তক্ষেপ না থাকায় শাসক পরিবর্তিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচারক বা কাজী অপরিবর্তিত থাকতেন। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাসকের কোনো সার্বভৌমত্ব ছিল না, শাসক আইনের উৎস ছিলেন না, তার নিজস্ব কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনী ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ও ছিল না। তিনি শরীয়াহ দিয়ে শাসন করতেন, শরীয়াহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেন এবং শরীয়াহকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এর সীমানার মধ্যে থেকে উম্মাহর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন।

যমীনে আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষ যেন কোনো বাধার সম্মুখীন না হয়, সে বিষয়ে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এর বিনিময়ে তিনি জনগণের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর নিতেন। কিন্তু এই করব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কিছু শরীয়াহসম্মত মানদণ্ড ছিল। যেমন যাকাত, উশর ইত্যাদির ক্ষেত্রে একেবারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যার বাইরে যাওয়ার অধিকার শাসকের ছিলনা।

ফলে অতিরিক্ত কর আরোপ সহজেই চিহ্নিত করা যেত। এবং ইসলামী আদালতে এর বিরুদ্ধে অভিযোগও করা যেত। আধুনিক রাষ্ট্রের মতো ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো না থাকায়, শাসক সমাজে নিজের ইচ্ছামতো হস্তক্ষেপ করতে বা প্রশাসনিক অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারতেন না। ইসলামী আইনবিদ, মুফতি ও আলিমগণ সমাজে জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ফলে আধুনিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র ব্যবহার করে সরকার যেভাবে নাগরিক জীবনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারে, ইসলামী সমাজে তেমন হত না। এই প্রতিনিধিরাই শরীয়াহ অনুযায়ী দেশ শাসনের শর্তে শাসককে বৈধতা দিতেন। শরীয়াহ লঙ্ঘন করা হলে সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃস্থানীয়দের সমর্থন তুলে নেয়ার মাধ্যমে শাসকের সেই বৈধতা বিলুপ্ত হয়ে যেত।

কেননা, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাসকের মূল কাজ ছিল শরীয়াহর শাসন নিশ্চিত করা। শরীয়াহর আলোকে পার্থিব বিষয়গুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মুসলিম ও আহলুয যিম্মাহর জানমাল ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজের প্রত্যেকে যেন শরীয়াহসম্মত নৈতিক সত্তা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে—এগুলো নিশ্চিত করা ছিল শাসকের প্রধান দায়িত্ব। এসবের ওপর যেকোনো আঘাত শাসকের কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করত। মুসলিম ও আহলুয যিম্মাহর (যারা অমুসলিম হলেও ইসলামী শাসনব্যবস্থার অধীনে বসবাস করত) সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শাসক নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে বাধ্য থাকতেন।

- কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে শরীয়াহ প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও রক্ষা করা।

- হুদুদ বাস্তবায়ন করা।

- নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা।

- সীমানা রক্ষা করা ও রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- গনিমত ও অন্যান্য যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বণ্টন করা।
- যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন করা।
- কাজী, মুহতাসিব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা ও তাদের কার্যকলাপ দেখাশোনা করা।
- এতিম ও যাদের কোনো উপযুক্ত অভিভাবক নেই, তাদের দায়িত্ব নেওয়া ও দেখভাল করা।

এসব কিছুর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শাসক শরীয়াহসম্মত শাসননীতির আলোকে কিছু নিয়ম-কানুন ও বিধিমালা জারি করতে পারতেন। এটি মূলত একটি সুলতানি বিধিমালা। শাসকসহ তার সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এই বিধিমালার অধীন থাকতেন।

সার্বিক আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো ও শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী শাসনকাঠামো ও শাসনব্যবস্থার কোনো মিল নেই। অনেকে দাবি করেন, আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অর্থাৎ, আধুনিক রাষ্ট্র থেকে ইসলামবিরোধী মূল উপাদান বাদ দিয়ে শুধু এর কাঠামো বা খোলসের ভেতরে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায়। সহজভাবে বললে, তারা আধুনিক রাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌমত্ব, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ইত্যাদি সরিয়ে দিতে চান। এরপর এই কাঠামোর মধ্যেই শরীয়াহ বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তর্কের খাতিরে এবং আলোচনাকে সহজ করার স্বার্থে গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোনো ইসলামী গণতান্ত্রিক দলের ক্ষমতায় গিয়ে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা জায়েজ কি না—এই বিতর্ক আপাতত বাদ রাখা হলো।

ধরে নেওয়া যাক, কোনো একটি ইসলামী দল ক্ষমতায় এসেছে। তারা আধুনিক রাষ্ট্রের সব প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র বা কাঠামো বহাল রেখেছে। অর্থাৎ, সংসদ, আমলাতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা—সবকিছুই অক্ষুণ্ন আছে। এ অবস্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল দাবি অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং শরীয়াহবিরোধী বা অনৈসলামী কোনো আইন সংসদে উত্থাপিতই হতে পারে না। এমনকি সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত কোনো আইন উত্থাপন করা হলেও এবং তার পক্ষে সব সংসদ সদস্য 'হ্যাঁ' ভোট দিলেও সেটি জায়েজ হবে না। কারণ, আল্লাহর কোনো ফয়সালা বা বিধানের ওপর মানুষের 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই। অবস্থা যদি এমন হয়, তবে এই শাসনব্যবস্থায় সংসদের মূল কাজ কী? সংসদীয় ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখারই বা অর্থ কী?

ধরা যাক, কোনো শরীয়াহ আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দুই বা তিনটি ভিন্ন মত পাওয়া গেল। প্রতিটি মতই শরীয়াহসম্মত ও বৈধ। তখন ইসলামী আইনবিশারদ, ফকিহ ও মুফতিদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়া যেতে পারে। আবার ক্ষেত্র, পরিস্থিতি ও এলাকাভেদে সব মতই গ্রহণযোগ্য বা চালু রাখা যেতে পারে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াতেও সাধারণ সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকে না। কারণ, তারা মূলত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তারা ইসলামী আইনবিশারদ বা ফকিহ নন। সুতরাং এই বাস্তবতায় আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থার কোনো কার্যকর ভূমিকাই অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় আধুনিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও আইনকে রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে সব জায়গায় জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার কাজ করে। এর মূল

উদ্দেশ্য হলো আধুনিক রাষ্ট্রকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা একক ক্ষমতার উৎসে পরিণত করা। একই সঙ্গে এটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে থাকা সব ধরনের সামষ্টিক উদ্যোগ, সমাজের স্বাধীনতা ও নিজস্ব স্বায়ত্তশাসনকে ধ্বংস করে। আমলাতন্ত্রের পরিধি ও এখতিয়ার আধুনিক রাষ্ট্রের ভেতরে ব্যক্তিগত পরিসর, নাগরিক সমাজসহ সর্বস্তরে বিরাজমান থাকে। এভাবে পুরো রাষ্ট্রের সব কাজকর্মকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে আমলাতন্ত্র যেকোনো রাষ্ট্রকে একটি অতিকায় দানবে পরিণত করে যার হাত হিসেবে কাজ করে আমলাতন্ত্র।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা নিয়ে আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য পূরণ করে না। আগেই বলা হয়েছে- ইসলামী শাসনব্যবস্থা একই সঙ্গে নৈতিক ও সামাজিক। সমাজের মসজিদ, হাসপাতাল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপ ও বিচার-ফয়সালা—সবকিছুই সেই সমাজ বা জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এই ধরনের স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণ সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ করা সম্ভব।

এছাড়া, আমলাতন্ত্র একটি বহুস্তরীয় ও স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা। একজন আমলা বা কর্মকর্তা সামাজিক উন্নয়নের প্রতি যতটা না দায়বদ্ধ থাকেন, তার চেয়ে বেশি দায়বদ্ধ থাকেন নিজের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বসের প্রতি। এই অতিকায় ব্যবস্থায় সর্বত্র জবাবদিহির ঘাটতি দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় কোনো একটি নির্দেশ সব স্তর পার হয়ে বাস্তবে রূপ নিতে গেলে চরম দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়।

সুতরাং, এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হলে তা তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি অতিকায়, দমনমূলক ও বলপ্রয়োগকারী সংস্থায় পরিণত করবে। এটি কোনোভাবেই শরীয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে না।

তথাকথিত সেই কল্পিত আমলাতান্ত্রিক ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা যদি আধুনিক রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার আদলে গড়ে ওঠে, তবে সেটিও শরীয়াহর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অক্ষম হবে। কারণ, আধুনিক বিচারব্যবস্থা মূলত কেবল একটি আইনী ক্ষেত্র। অর্থাৎ এটি শুধু বৈধ-অবৈধ এর ধারণা নিয়ে কাজ করে। এখানে নৈতিক-অনৈতিক বলে কিছু নেই। কিন্তু ইসলামী শাসনব্যবস্থার বিচারিক কাঠামো একই সঙ্গে নৈতিক, আইনী, সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে। এটি শুধু বিচারকার্য পরিচালনা করে না। বিচারের পাশাপাশি ইসলামী আদালত মধ্যস্থতা, সমঝোতা এবং সামাজিক সম্পর্ক অটুট রাখার কাজও করে। এমনকি সমাজ থেকে সম্পর্ক ভাঙা ও বিবাদের মূল কারণগুলো দূর করতেও সচেষ্ট থাকে।

সমাজকে যদি নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন দেওয়া না হয়, তবে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। সমাজের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীন বিকাশ ছাড়া ইসলামী আইনের মাধ্যমে পরিচালিত বিচারব্যবস্থা বড়জোর একটি নৈতিক ও আইনী ক্ষেত্র হতে পারবে। কিন্তু এটি কখনো সামাজিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর হয়ে উঠতে পারবে না। এর ফলে শরীয়াহর প্রকৃত সুফলও ভোগ করা সম্ভব হবে না। অতএব, শরীয়াহর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হলো আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা। এর পাশাপাশি বিচারিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ রাষ্ট্রের সব নীতি ও ব্যবস্থাপনাকে সমাজকেন্দ্রিক বা সমাজমুখী করে তুলতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শরীয়াহর শাসন প্রতিষ্ঠার অর্থ কেবল কিছু ইসলামী আইন দিয়ে শাসন পরিচালনা করা নয়। বরং শরীয়াহর স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করে বা শরীয়াহর শাসনের সুফল পূর্ণভাবে পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়—এমন সব প্রতিবন্ধকতা

দূর করাও শরীয়াহ বাস্তবায়নের অংশ।

আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামো বা অবয়বের মধ্যে কেবল কিছু ইসলামী আইন প্রবেশ করিয়ে আদতে তেমন কোনো লাভ হবে না। সমাজকে যদি নিজের কার্যক্রম ও স্বকীয়তা পরিচালনার সুযোগ না দেওয়া হয়, সমাজকে ইসলামের আলোকে বিকশিত হতে না দেয়া হয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণও শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন, সমাজবিমুখ, মোহগ্রস্ত ও হতাশ হয়েই রয়ে যাবে।

???????

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা শুধু দুটি ভিন্ন শাসনপদ্ধতি নয়, এদের ভিত্তি, কর্তৃত্বের উৎস, লক্ষ্য এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক—সবকিছুতেই মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জাতীয় পরিচয় এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব। এখানে রাষ্ট্র নিজেই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব। আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও বাতিল করার চূড়ান্ত ক্ষমতা তার হাতে। ধর্ম, নৈতিকতা কিংবা সামাজিক মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় আইনের অধীন। রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে সেগুলোকে অনুমোদন করতে পারে, সীমিত করতে পারে, এমনকি নিষিদ্ধও করতে পারে। এতে ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিজেই একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত হয়। নিজের অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব রক্ষাই তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই উদ্দেশ্য পূরণে রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদ, আমলাতন্ত্র, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে। সমাজের প্রতিটি মানুষ, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকে সে নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে।

অন্যদিকে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় শাসক বা শাসনকাঠামো নিজে কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এটি শরীয়াহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম। এখানে শাসক আইনের উৎস নন। তিনি নিজেও শরীয়াহর অধীন। তার ক্ষমতার বৈধতা নির্ভর করে শরীয়াহর শাসন রক্ষা এবং মানুষের জানমাল, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সমাজ কেবল রাষ্ট্রের অধীন একটি নিষ্ক্রিয় জনসমষ্টি নয়। সমাজের নিজস্ব ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে। মসজিদ, ওয়াক্ফ, আদালত, বাজার, পরিবার এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী—সবকিছুই সমাজের ভেতর থেকে পরিচালিত হয়। শাসনব্যবস্থা সমাজকে গ্রাস করে না; বরং সমাজের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ রক্ষা করে।

এই কারণেই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে শুধু কিছু ইসলামী আইন বসিয়ে দিলেই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। আইন বদলালেও রাষ্ট্রের সার্বভৌম চরিত্র, কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র, সমাজের ওপর সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়তাবাদী পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকলে শাসনের প্রকৃতিও অক্ষুণ্ণ থেকে যায়।

সংসদের নাম বদলে শুরা, আদালতের আইনে শরীয়াহর কিছু ধারা এবং রাষ্ট্রের নামের আগে 'ইসলামী' শব্দ বসানো যেতে পারে। কিন্তু কাঠামোর মূল দর্শন অপরিবর্তিত থাকলে পরিবর্তনটি কেবল বাহ্যিক হয়। পুরোনো রাষ্ট্র তখন নতুন ভাষায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাই শুধু শাসকের পরিচয় বদলানো যথেষ্ট নয়। শুধু রাষ্ট্র ও আইনের নাম বদলানোও যথেষ্ট নয়। শাসন কাঠামো ও কর্তৃত্বের উৎস ও উদ্দেশ্য না বদলালে প্রকৃত পরিবর্তন আসে না।

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল, আমাদের যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র রয়েছে তা কেবল সংস্কার ও ধারাবাহিক কিছু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক ও মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা এই ব্যবস্থা কেবল আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক মুক্তির পথে বাধা, তা-ই নয়। বরং মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তা আলার ইবাদতের লক্ষ্যেও এই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে মুক্তি দরকার। আমাদের আরো বোঝা দরকার - জাতীয়তাবাদের ঠুনকো রোমান্টিক দর্শন আমাদেরকে ইনসাফ, স্বাধীনতা ও সুবিচার এনে দিতে পারে না। আর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মানুষের হিদায়াত ও আত্মিক মুক্তির বিষয়টি তো আরো সুদূর পরাহতই রয়ে যাবে।

তাই আমরা বলি - ইসলামী কর্তৃত্ব, কুরআনের শাসনই এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান। পশ্চিমা উপনিবেশায়নের ব্যাপক বিস্তারের আগে যে নিযাম মানুষের জাগতিক কল্যাণ ও হিদায়াতের কারণ হয়েছিল, পুনরায় সেই কল্যাণ ও ইনসাফ ফিরিয়ে আনতে তাই ইসলামী বিপ্লবই একমাত্র সমাধান। এলক্ষ্যে তাই ইসলাম ও বিপ্লবের পথে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাওয়াই শরীয়াহ, সময় ও বাস্তবতার দাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এপথে চলার তাওফিক দান করুন। (আমীন)